সুন্দরবনে ইসলাম

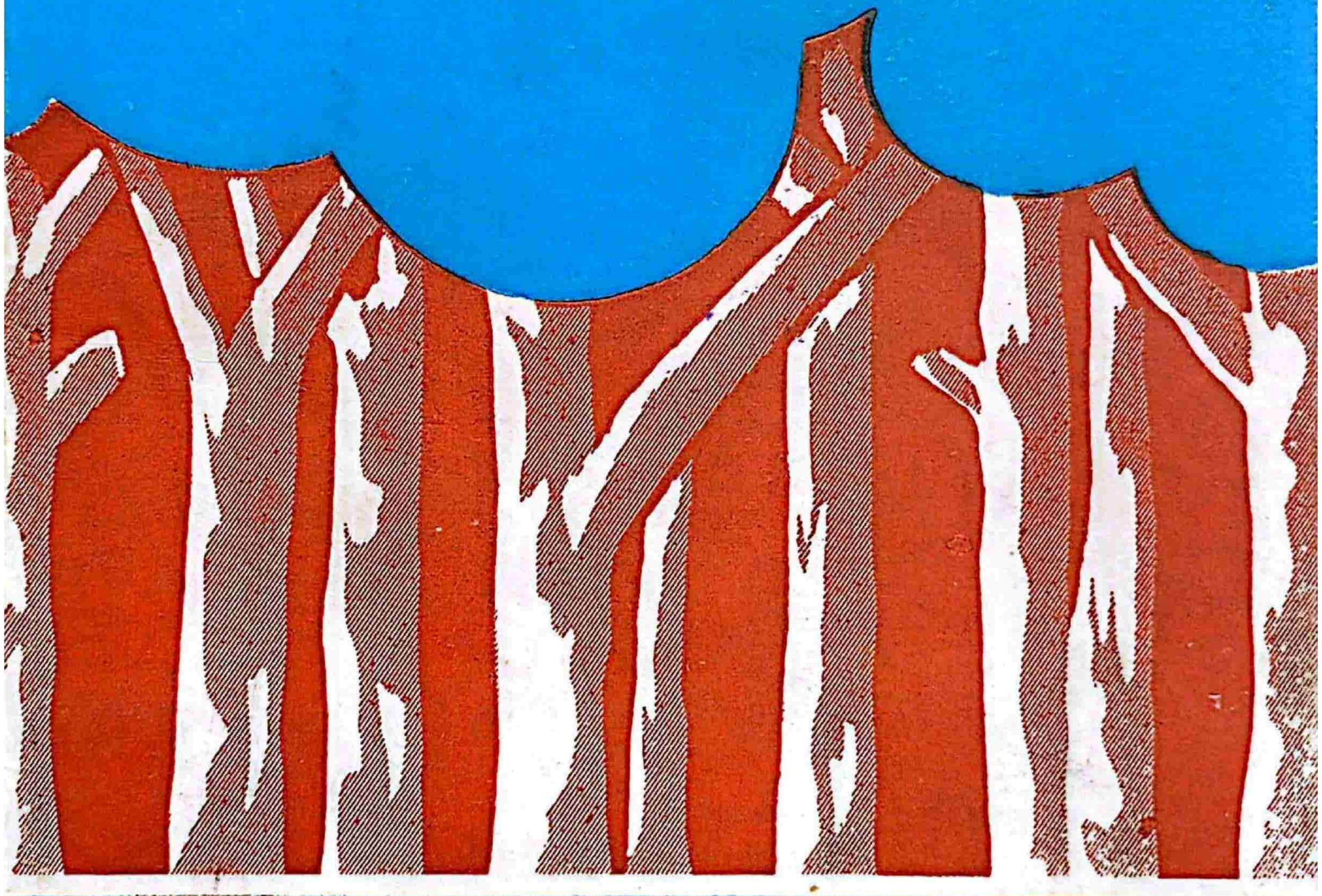

ডঃ এম. আবদুল কাদের

CamScanner

সুন্দরবনে ইসলাম

MAHFUJA MALIK MUNMUN
KHULNA.
BOOK NO
93, SOUTH CENTRAL RD

ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সিলেট
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

ই. ফা. প্রকাশনা : ২৫৯
সুন্দরবনে ইসলাম :
ডঃ এম. আবদুল কাদের

দ্বিতীয় সংস্করণ :
এপ্রিল, ১৯৮০
চৈত্র, ১৩৮৬
জমাদিউল আউয়াল, ১৪০০

প্রকাশনায় :
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সিলেট
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা—২

মুদ্রণে :
মুহিউদ্দীন শামী
অক্ষরিকা মুদ্রণ,
২৭, শুকলাল দাস লেন,
ঢাকা-১

মূল্য : ১·২৫ টাকা

SUNDARBANAY ISLAM : Islam in Sundarbon written by Dr. M. Abdul Qader in Bengali and published by the Islamic Cultural centre, Sylhet to celebrate the commencement of 1400 Al-Hijra.

Price : Tk. 1·25

MAHFUJA MALIK MUNMUN
KHULNA.
BOOK NO......
98, SOUTH CENTRAL RD

প্রকাশকের কথা

খৃস্টানদের যেমন দুনিয়া জোড়া মিশনারী প্রতিষ্ঠান বা ধর্মপ্রচার সমিতি আছে, মুসলিমদের তেমন কিছু নাই। সৈন্য-সেনাপতি, সওদাগর, দেশ পর্যটক প্রভৃতি হিসাবে তাঁহারা যখন যেখানে যাইতেন সেখানেই অবসর মত অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইতেন। কিন্তু ইসলামের প্রধান প্রচারক ছিলেন ফকীর-দরবেশ ও আলিমেরা। ইঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ আরব। প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া হাজার বিপদ ঘাড়ে লইয়া ইঁহারা ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য দুর-দুরান্তরে বিধর্মী অধ্যুষিত জনপদে ছুটিয়া যাইতেন। সাধারণত তাঁহাদের ধর্মপ্রাণতা ও ইসলামের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই ইসলাম কবুল করিত, কেহ কেহ বা এত অন্যায় উৎপীড়ন ভোগ করিতেন ও এত প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতেন যে, যুদ্ধে মৃত্যুবরণই শ্রেয়স্কর মনে করিতেন। জনসাধারণ গাজী আখ্যা দিয়া ইঁহাদের প্রতি সম্মানও দেখাইত; কেহ বা শহীদ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। যেমন বড় খান গাজী, কল্লা শহীদ ইত্যাদি।

দক্ষিণ বঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান খুলনা, যসোর ও চব্বিশ পরগনার কিয়দংশ ছিল মধ্যযুগে বাঘ, ভালুক কুম্ভীর, শূকর, ও তীব্র বিষধর সর্প পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য। মুসলিমদের নিকট তাড়া খাইয়া অনেক হিন্দু-বৌদ্ধ, বিশেষতঃ সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা এখানে আশ্রয় লয়। কোন মুসলিম শাসনকর্তা বা সুলতান অজস্র নদ-নদীপুর্ণ এই স্বাপদ সঙ্কুল জনপদে কখনও হানা দিতে সাহসী হন নাই। এখানে ইসলামের আলো প্রজ্বলিত করেন কয়েকজন ফকীর-দরবেশ। কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত কেহই ইঁহাদের কোন খোজ-খবর রাখতেন না। অথচ ইহাদের নিকট আমরা কতই না ঋণী। প্রখ্যাতনামা গবেষক ডঃ এম. আবদুল কাদের ইঁহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকাখানা প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-

পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুর্বে (১৯৬৯) প্রকাশিত হইলেও ১৯৭১ সনের দেশে ব্যাপক অরাজকতার সময় এগুলির অধিকাংশ পাকিস্তান একাডেমীর অসাধু কর্মচারীরা মণ দরে বিক্রয় করিয়া দেয়; কাজেই তাঁহার মেহনতের ফল জনসাধারণের নিকট পৌছাইতে পারে নাই বলিলেই হয়; আকারে ছোট হইলেও পুস্তিকাখানিতে পরিবেশিত তথ্য অনেক বড়; তজ্জন্য ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইল। আশা করি, পাঠকেরা ইহা পাঠে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন এবং অবশিষ্ট বাংগালীর ইসলাম বিস্তারের বিবরণ জানিতে আগ্রহান্বিত হইবেন।

CamScanner

সূচীপত্র

গোরাই গাজী/১
মুবারক গাজী/৬
একদিল শাহ/১০
উলুজ খান জাহান/১৪
বড় খান গাজী/২২

CamScanner

সুন্দরবনে ইসলাম

CamScanner

সুন্দরবনে ইসলাম

গোরাই গাজী

আনুমানিক ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক অদ্ভূতকর্মা পীর চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালিন্দায় আগমন করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় না। সাধারণ্যে তিনি গোরাচাঁদ বা গোরাই গাজী নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ রঙ গোরা ছিল বলিয়া ব্যবহারের অভাবে প্রকৃত নাম লোপ পাইয়া তিনি এই নামেই সমধিক পরিচিত হন। গোরা-চাঁদ স্পষ্টতঃ হিন্দু নাম। তিনি কোথা হইতে এ অঞ্চলে তশরীফ আনেন বা তাঁহার পূর্ব-পুরুষের নাম কি, তাহার কিছুই জানা যায় না। কাজেই তিনি ধর্মত্যাগী হিন্দু হইতেও পারেন। হিন্দুয়ানী নাম ও ইসলাম প্রচারে তাঁহার মরণপণ উৎসাহ দেখিয়া ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

হিন্দু আমলে বালিন্দা বা বালাণ্ডী ছিল বাগড়ী বিভাগের একটি প্রধান শাসনকেন্দ্র; সুলতানেরাও সেখানে একজন শাসনকর্তা রাখিতেন। প্রাচীন দ্বিগঙ্গার নিকটস্থ দেউলিয়ায় তখন চন্দ্রকেতু নামক জনৈক ধনবান জমিদার বাস করিতেন। ইনি ছিলেন ঘোর মুসলিম-দ্বেষী গোঁড়া হিন্দু। কাজেই পীর সাহেব ঠিক করিলেন, ইহাকে মুসলিম বানাইতেই হইবে। একটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া গোরাচাঁদ. চন্দ্রকেতুর গৃহের নিকট গিয়া আস্তানা গাড়িলেন। কি অসীম সাহস। চন্দ্রকেতু বলিলেন, পীর তোমার ক্ষমতা দেখাও। গোরাচাঁদ লৌহ-দণ্ডকে কলায় পরিণত করিলেন, মৃত ব্রাহ্মণের দেহে প্রাণ আনিয়া দিলেন; কিন্তু কিছুতেই চন্দ্রকেতুর মন টলিল না। ফিরাউনের ন্যায় তিনিও বলিলেন, পীর, সবই তোমার ভেল্কি।

হতাশ হইয়া গোরাচাঁদ হাতিয়াগড় তহসিলে গমন করিলেন। রাজা মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ তখন সেখানে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তাঁহারা প্রতি বৎসর একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন। তাঁহা-

দের রাজ্যে একজন মাত্র মুসলিম ছিল। তাহার নাম মুমিন। গোরা-চাঁদ যেইবার সেখানে আসিলেন. সেইবার মুমিনের বলির পালা। তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া পীর সাহেব নিজেই তাহার বদলি হইতে চাহিলেন। রাজার লোকেরা তাঁহাকে বকানন্দের নিকট লইয়া গেল। সেখানে গিয়া তিনি কিন্তু উল্টা সুর ধরিলেন। বকানন্দ তাঁহার মাথা কাটিতে বলিলে তিনি চোখ পাকাইয়া বলিলেন, আমি হইলাম মুসলিম, হিন্দুর দেবতার বলি হইতে যাইব কেন? ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বেশ বচসা হইল। কথা কাটাকাটি শেষে মারামারিতে দাঁড়াইল। বকানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া গোরাচাঁদকে আক্রমন করিলেন। তিনিও হটিবার পাত্র নহেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁহারই জয় হইল, বকানন্দ নিহত হইলেন।

ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অক্ষয়ানন্দের মাথায় যেন অশনিপাত হইল। তিনি বুঝিলেন, এই পীর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও সাধারণ অস্ত্রের অভেদ্য। কাজেই তিনি তাঁহার বাস্তু দেবতা শিবের শরণাপন্ন হইলেন। শিব তাঁহাকে একটি অস্ত্র দিলেন। তাহা লইয়া তিনি গোরা-চাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন এবং তাঁহাকে ঘায়েল করিতে সমর্থ হইলেন।

তোড়জোড় দেখিয়া মনে হয়, পীর সাহেব তখন আর 'ভৃত্যমাত্র সম্বল' ছিলেন না। ইতোমধ্যে যথেষ্ট দলবল জুটাইয়া লইয়াছিলেন এবং প্রথম যুদ্ধ দুই ভ্রাতার সঙ্গেই হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট ভ্রাতা দেবতার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং শত্রুরাজ্যে সেনাপতি মারাত্মক রূপে আহত হওয়ায় পীর সাহেবের পরাভুত বাহিনীর অবশিষ্টেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল।

আহত দরবেশ জখমে পট্টি বাঁধিবার জন্য ভৃত্যকে কয়েকটি পান আনিতে বলিলেন; কিন্তু বেচারা কোথাও পান পাইল না। কথিত আছে, এজন্য হাতিয়াগড়ে কখনও পান জন্মে না; আশ্চর্যের বিষয়, অদ্যাপি সেখানে কেহ পানের চাষ করে না।

অগত্যা পীর সাহেব হাড়োয়ার চারি মাইল দূরস্থ কুলটি

বেহারিতে চলিয়া আসিলেন। এখানে বিনা চিকিৎসায় তাঁহার দেহ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া এতদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্যও স্থানান্তরে চলিয়া গেল; কিন্তু আল্লাহর কি অদ্ভূত লীলা! কোথা হইতে একটি গাভী আসিয়া প্রত্যহ গোরাচাঁদকে দুধ খাওয়াইয়া যাইত। ক্রমাগত ছয় দিন কেহ তাঁহাকে দুধ খাইতে না দেখিলে হয়ত তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইত; কিন্তু সেই গাভীর মালিক কিনু ঘোষ ও কালু ঘোষ কয়েক দিন দুধ না পাওয়ায় কিসে দুধ খাইয়া যায়, দেখিবার জন্য পাহারায় বসিল। গাভীটি যথারীতি গোরাচাঁদকে দুধ খাওয়াইতে গেলে তাহারা তাহা দেখিয়া ফেলিল। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া পীর সাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে ইসলামী প্রথায় কবর দিও। অল্পক্ষণ পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। সেদিন ১২ই ফাল্গুণ। ঘোষেরা তাঁহার মরদেহ হাড়োয়ায় লইয়া গিয়া সমাহিত করিল।

এক ব্যক্তি ইহা দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে যত্রতত্র উপহাস করিতে ও ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া একদা তাহারা রাগের মাথায় লোকটিকে হত্যা করিয়া ফেলিল। এই অপরাধে ধৃত হইয়া তাহারা গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট বিচারার্থ প্রেরিত হইল। তাহাদের অসহায় বনিতারা গোরাচাঁদের গোরস্তানে গিয়া মর্মভেদী বিলাপ জুড়িয়া দিল। তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া পীর সাহেব হঠাৎ কবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সটান গৌড়ে গিয়া হতভাগ্য গোয়ালাদের খালাস করিয়া আনিলেন। গোরাচাঁদ তখনও চন্দ্রকেতুর কথা ভুলিয়া যান নাই। তাঁহাকে সুপথে আনয়নের জন্য তিনি আবার গৌড়ে গিয়া পীর শাহ নামক এক ব্যক্তির নামে বালিন্দার শাসনকর্তার সনদ লইয়া আসিলেন। ইনি ছিলেন স্পষ্টতঃ পীর সাহেবের খয়েরখাহ্। কার্য ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি চন্দ্রকেতুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'রাজা' হুকুম

তামিল করিলেন ; কিন্তু যাত্রাকালে এক জোড়া শিক্ষিত পায়রা সঙ্গে লইয়া গেলেন। পরিজনদের বলিলেন, ভাগ্য বিরূপ হইয়াছে দেখিলে তিনি ঐগুলি ছাড়িয়া দিবেন ; উহারা গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাহারা যেন আত্মহত্যা করে। পীর শাহ চন্দ্রকেতুকে বধ করিলেন না সত্য কিন্তু এত উত্যক্ত করিলেন যে তিনি হতাশ হইয়া কবুতর ছাড়িয়া দিলেন। উহাদের উড়িয়া আসিতে দেখিয়া পরিজনেরা পানিতে ডুবিয়া মরিল। এদিকে চন্দ্রকেতু খালাস পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্তু হায়! ততক্ষণ সব শেষ! মনের দুঃখে তিনি নিজেও আত্মহত্যা করিলেন। সোনার দেওলিয়া না-হক্ শ্মশান হইয়া গেল। চন্দ্রকেতু মরিয়াও ধর্মরক্ষা করিলেন।

সম্ভবতঃ গোরাচাঁদের হাড় (দেহাস্থি) আছে বলিয়াই হাড়োয়া নামের উৎপত্তি। ইহা কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূরে। সুলতান আলাউদ্দীন (১২৩০-৩৭) তাঁহার সমাধির উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন এবং উহার ব্যয় নির্বাহার্থ ১৫০০ বিঘা লা-খেরাজ জমি দান করেন। ফাল্গুন মাসের ১২ তারিখে সেখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে ; তাহাতে বিশ ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হয়। মেলা মাসের শেষ পর্যন্ত থাকে এবং চাউলই বিক্রয় হয় বেশী। কিনু ও কালুর বংশধরেরা দীর্ঘকাল যাবত মেলার আয় ভোগ করিত ; পরে তাহাদের পরিবার বিলুপ্ত হইয়া গেলে কবরগাহটি মুসলিমদের হাতে আসে।

সুন্দরবনের অন্যান্য ইসলাম প্রচারকের ন্যায় গোরাচাঁদ এক্ষণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেরই পীর। ফকীরেরা এখনও কলিকাতার রাস্তার ধারে ও অন্যত্র সন্ধ্যাকালে বাতি জ্বালাইয়া 'পীর গোরাচাঁদ মুশকিল আসান' বলিয়া গান গাহিয়া ভিখ মাগিয়া বেড়ায়। যশোর খুলনার বহু স্থানে হিন্দুরা সত্যপীরের মত 'আসান-নারায়ণের' শিরনী দেয়। সত্যপীরকে তাহারা যেমন সত্যনারায়ণে পরিণত করিয়াছে, ইহাকেও তেমনি দেবতার আসনে উন্নীত করিয়া জাতে তুলিয়া লইয়াছে।

হিন্দু রাজাদের সহিত লড়িলেও তিনি যে গভীর ধর্মপ্রাণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার বলে জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভক্তি লাভে সমর্থ হন, তাহার এতদপেক্ষা উজ্জলতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা না গেলেও তিনি যে সম্ভবত সুন্দরবনের প্রথম আবাদী ও প্রাথমিক ইসলাম প্রচারক ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

———

মুবারক গাজী

বাঁসড়া চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ময়দানমল তহসিলের বিদ্যাধরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা সুন্দরবনের কাঠের কারবারের একটি বড় আড়ত ও রেল-স্টেশন। এখানকার ধনবান জমিদার পরিবারের উত্থান-কাহিনী জনৈক ফকীরের সহিত সংশ্লিষ্ট; তাঁহার নাম মুবারক গাজী বা মুবরা গাজী। ময়দানমলের অধিকাংশই ছিল তখন স্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যাবৃত। বর্তমান জমিদার বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ইহা বন্দোবস্ত আনেন। বাঁসড়া ছিল এই জঙ্গলের মধ্যে। আনুমানিক ১৫০০ খীস্টাব্দে মুবারক বা মুবরা গাজী আসিয়া এখানে আস্তানা গাড়েন। বন্য জন্তুগুলি তাঁহার এতই বশীভূত হয় যে একটি ভীষণদর্শন শার্দুল নিয়ত তাঁহাকে পিঠে লইয়া বেড়াইত। একবার জমিদারের খাজনা বাকী পড়িলে বাদশাহের কর্মচারীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। পুত্রশোকাতুরা জননী ফকীরের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া সন্তানের মুক্তি কামনায় তাঁহার শরণাপন্ন হন। বিপন্না বিধবার কাকুতি মিনতিতে ফকীরের মন গলিয়া গেল। তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

একদা বাদশাহ আরামে শুইয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্নে দেখিলেন, মুবরা গাজী বন্য পশুপালবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমি ময়দানমল জঙ্গলের মালিক; জমিদারের খাজানা ভূগর্ভে প্রোথিত আমার ধন-ভাণ্ডার হইতে পরিশোধ করা হইবে; সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমার গুরুতর বিপদ ঘটিবে। বাদশাহ

ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নটি লিখিয়া রাখিলেন ; কিন্তু উহার আদেশ তামিল করিলেন না। পরদিন তিনি সিংহাসনে বসিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার উমরাহ বা উযীর-নাযীর কেহই নাই ; আছে শুধু অগণিত হিংস্র পশু। অমনি স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ জমিদারের মুক্তির আদেশ জারী হইল। তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া আনিলে বাদশাহ একদল প্রহরী সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বিদায় বেলায় বলিলেন, মুবরা গাজীর ধন-ভাণ্ডার কোথায় লুক্কায়িত আছে জানিয়া লইবেন এবং তাহা উদ্ধার করিয়া আমার রাজস্ব পাঠাইয়া দিবেন।

গৃহে ফিরিয়া জমিদার তাঁহার মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। স্নেহময়ী জননী তৎক্ষণাৎ মুশকিল-আসান ফকীরের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাহার কাতর অনুরোধে গাজী সাহেব তাঁহার ধনরত্ন যেখানে লুক্কায়িত ছিল তাহা দেখাইয়া দিয়া হঠাৎ সেখান হইতে গায়েব হইয়া গেলেন। ইহাতে মহিলাটির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরদিন মাতাপুত্র স্থানটি খুঁড়িয়া এত অর্থ পাইলেন যে বাদশাহের খাজানা শোধ দিয়াও অনেক টাকা বাকী রহিয়া গেল। কৃতজ্ঞ জমিদার তদ্বারা বাঁসড়ার অরণ্যে একটি মসজিদ তুলিতে চাহিলেন ; কিন্তু ফকীর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, আমার কোন মসজিদ বা ঘর-বাড়ীর দরকার নাই, আমি জঙ্গলে থাকিয়া কাঠুরিয়াদের নযর-নেয়াযে তৃপ্ত থাকিতেই সমধিক ভালবাসি। প্রতি গ্রামে 'বন ও বন্য পশুর রাজা' মুবরা গাজীর নামে দরগাহ উঠাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আদেশ জারী হইল। জমিদার প্রজাদের আরও সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, জঙ্গলে যাইবার পূর্বে পীর সাহেবের নামে নযর না দিলে তাহাদের বাঘে খাইবে। কেবল ময়দানমলে নহে, সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী সমগ্র তহসিলের প্রত্যেকটি গ্রামেই মুবরা গাজীর দরগাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উসিলায় পানাহ না চাহিয়া কোন কাঠুরিয়াই কখনও বনে যায় না।

মুবরা গাজী ময়দানমল তহসিলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত শাহজাদপুরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। স্পষ্টতঃ ইনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন।

CamScanner

কিংবা তাঁহার পিতাকে যুদ্ধে হারাইয়া বিবাহের স্মৃতি রক্ষার জন্য গাজী সাহেব চারিটি বৃক্ষ রোপণ করেন ; উহাদের তিনটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেও বর্তমান ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তান প্রিন্সেস ইহা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখিতে পান। পুনরায় আবাদ করার পর সেখানে পূর্ব সমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মসজিদ কুঁড়ের মসজিদও এভাবে জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কথিত আছে, একবার দেশে ভীষণ অনাবৃষ্টি হইলে লোকে গাজী সাহেবের নিকট ধন্না দেয়। তিনি দোয়া করিবার জন্য একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন এবং সকলকে দরজা না খোলার জন্য সাবধান করিয়া যান ; কিন্তু তিন দিন পরেও তিনি বাহিরে না আসায় তাহাদের ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনি সংজ্ঞাহীন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাহারা সেখানেই তাঁহাকে সমাহিত করিল। সেদিনই প্রবল বারিপাত হইল। রাতে তিনি জনৈক সাগরিদকে দেখা দিয়া বলিলেন, লোকে আমার ধ্যানমগ্ন দেহকে মৃত ভাবিয়া কবর দিয়াছে। ইহা ছাড়া মুবরা গাজীর জীবনী সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

কলিকাতার ২০ মাইল দূরস্থ ঘুটিয়ারি শরীফে তাঁহার দরগাহ্ আছে। উত্তর কালে সেখানে তাঁহার কবরের উপর একটি বিরাট মনোরম মসজিদ নির্মিত হয়। অম্বুবাচীর সময় উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে তাঁহার সম্মানার্থ অম্বুবাচীর মেলা বসে ; ভাদ্র মাসে বসে আর একটি। হিন্দু-মুসলিম সকলেই তাঁহার দরগায় শিরণী দেয়। প্রতি শুক্রবারে সেখানে বহু লোক জমায়েৎ হয়।

কয়েকজন ফকীর নিজেদেরকে মুবরা গাজীর বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। নৌকার মাঝি ও কাঠুরিয়াদের প্রদত্ত নযর-নেওয়াযই তাঁহাদের জীবিকার সম্বল। যেখানে কাঠ কাটিতে হইবে ফকীর সেখানে গিয়া তিন দিন রোজা থাকেন। কোথায় নিরাপদে কাঠ কাটিতে পারা যাইবে মুবরা গাজী তখন তাঁহাকে স্বপ্নে তাহা বলিয়া যান। তখন তাঁহার উদ্দেশ্যে নযর দিয়া নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে না যাওয়ার জন্য কাঠুরিয়াদের

CamScanner

সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়; নৌকা কাঠে ভর্তি হইলে আবার নযর দেওয়া হয়; এ সময় ফকীরও দুই একটি টাকা পায়। আশ্চর্যের বিষয়, নরখাদকের দল অরণ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেও কখনও ইহাদের আক্রমণ করে না বলিলেই হয়; অথচ কাঠ কাটিবার কুঠার ছাড়া তাহাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার আর কোনই হাতিয়ার থাকে না; ফকীরের দোয়ার উপর ভরসা রাখিয়া ইহা লইয়াই তাহারা নির্ভয়ে বনে যায়।

— —

একদিল শাহ

চব্বিশ পরগণা জিলার বারাসত মহকুমার আনারপুর তহসিলে কাজী-পাড়া নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে একদিল শাহ নামক জনৈক দরবেশের মাযার রহিয়াছে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর বা জানুয়ারীতে তাঁহার সম্মানার্থে এই মাযারের ধারে এক বিরাট মেলা বসে; হিন্দু-মুসলিম সকলেই তাহাতে শরীক হয়।

তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত উপকথার নিম্নে এমন ভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছে যে তিনি কোন সময়ের লোক বা কোথাকার অধিবাসী, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে যে লোক-প্রবাদ আছে, তাহা এই—

শাহ নীল নামক জনৈক রাজা আশিক নূরী নাম্নী এক মহিলার পানি-গ্রহণ করেন। তিনি কোন স্থানের রাজা বা তাঁহার বেগম কোন রাজার বা কাহার কন্যা, জানা যায় না। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তিনি কোন স্থানীয় রাজা হইবেন, নও-মুসলিম হওয়াও বিচিত্র নহে। মূল নাম বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া এই অনুমান অহেতুক মনে হয় না।

রাজা বিবাহ করিলেন সত্য; কিন্তু রাণীর কিছুতেই সন্তান হয় না। রাজা ভারি চিন্তায় পড়িলেন, রাণীরও খুব বদনাম হইল। একদিন ভোরে ঝাড়ুদারণী প্রাসাদে আসিল না। তাহাকে ডাকিতে লোক ছুটিল। সে বলিল, ভোরে রাজবাড়ীতে গেলে তাহাকে আটকুঁড়ের মুখ দেখিতে হয়; ইহা ভারি দুর্লক্ষণ কাজেই সে আহার না করিয়া কাজে যাইবে না। এই কথা রাণীর বুকে বাজিল। নিঃসন্তান সংসার তাঁহার নিকট

জাহান্নামের ন্যায় মনে হইল। তিনি রাজ-সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের মায়া কাটাইয়া তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলেন। মক্কা মোয়ায্যমাহ্, মদীনা মোনাওয়ারাহ প্রভতি নানা পবিত্র স্থানে ঘুরিয়া তিনি আল্লাহর নিকট অনেক কান্নাকাটি করিলেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসরের বন্দেগীর পর তাঁহার দোয়া কবুল হইল। একদা এক ফিরিশ্তা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিলেন, শেষে তাঁহার অটল ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া বলিলেন 'আল্লাহ্ আপনার আরযী মঞ্জুর করিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই এক পুত্র লাভ করিবেন; কিন্তু তাহাকে আড়াই দিনের বেশী গৃহে রাখিতে পারিবেন না।'

আড়াই দিনের শিশু কিরূপে ঘরের বাহির হইবে, তাহা রাণীর মাথায় ঢুকিল না। এতদিনে আটকুড়ে নাম ঘুচিবে শুনিয়াই তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে সত্যিই তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজবাড়ীতে ও রাজ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিল; কিন্তু অচিরেই হরিষে বিষাদ ঘটিল। খেঁকশিয়ালের বেশে এক ফিরিশতা আসিয়া ঠিক আড়াই দিন পরে শিশুটিকে মুখে করিয়া লইয়া গেল। রাণী তখন ঘুমে, দাই বে-খেয়াল। ব্যাপার টের পাওয়া মাত্রই চতুর্দিকে লোক ছুটিল; কিন্তু শিশুর কোনই পাত্তা মিলিল না। সারা দেশ আবার বিষাদে ডুবিল।

এদিকে রাজপুত্র মোল্লাতাব নামক এক ব্যক্তির গৃহে মানুষ হইতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তিনি একলা একটি বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া আনারপুরে আসিলেন। এত অল্প বয়সেই তিনি অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। কথিত আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভেড়া বানাইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার লোক বশীকরণের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তাহাই ভেড়া বানাইবার রূপকে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু বাঘ কি ভেড়া পাইলে আস্ত রাখিত?

অবশ্য ইহাই তাঁহার একমাত্র কেরামত নহে। তিনি লাঠি ভর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া প্রথমে যে গ্রামে উঠিলেন, উহার নাম বেরুয়া।

সেখানে তিনি মাটিতে লাঠি গাড়িলেন। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাইলেন যে তিনি সেই আল্লাহ-দত্ত রাজ্যের দখল লইয়াছেন। লাঠি দেখিতে দেখিতে বাঁশ ঝাড়ে পরিণত হইল, তিনিও পূর্ণবয়স্ক পুরুষে রূপান্তরিত হইলেন। অতঃপর তিনি আনারপুরের জমিদার চাঁদ খাঁর গৃহে গিয়া খানা খাইতে চাহিলেন। চাঁদ খাঁর ভ্রাতা নূর খান তখন এক মসজিদ তৈয়ার করাইতেছিলেন। আগন্তুককে সুস্থ সবল দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জোয়ান মানুষ, খাটিয়া খাইতে পার না। মসজিদে গিয়া কাজ কর, তবে খাইতে পাইবে।" দরবেশ বলিলেন, 'আচ্ছা'। তিনি মসজিদে গিয়া একটানে একখানা বিশমণি পাথর উঠাইয়া দেওয়ালের উপর এমন ভাবে রাখিলেন যে, তাহার উপরে আর ইট বসান চলিল না; ফলে, মসজিদের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। তখন হইতে প্রত্যেকটি অসমাপ্ত কার্যকে (তদাঞ্চলের) লোকে 'চাঁদ খাঁর মসজিদ' বলিয়া থাকে।

ইতোমধ্যে একদিল শাহ সকলের অলক্ষ্যে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন ও দীন মুহাম্মদ নাম ধারণ করিয়া একদল রাখাল বালকের সহিত মিলিত হইলেন। এখানে তিনি আরও অনেক কেরামত দেখাইলেন। অবশেষে তিনি ছুটি মিয়া নামক কাজীপাড়ার জনৈক ধার্মিক ও অতিথিপরায়ণ ভদ্রলোকের রাখালি লইলেন। সময় সময় তিনি গরুগুলিকে বেদম মারপিট করিতেন; কিন্তু মালিক দেখিতে আসিলে সেগুলিকে বাঘ ও শুকর বানাইয়া ফেলিতেন। একবার তাঁহার গরুতে কুমার শাহ নামক এক ব্যক্তির ধান খাইয়া ফেলিল। সে রাজদ্বারে নালিশ করিল। রাজকর্মচারী সরেজমিনে তদন্তে আসিয়া দেখিলেন, ঐ ক্ষেতের ধান অন্যান্য ক্ষেতের চেয়েও ভাল।

একদিল শাহের পূর্ব হইতেই আনারপুরে মুসলিম ছিল বলিয়া তাঁহাকে চতুর্দশ শতাব্দী বা তাহারও পরের লোক বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার কবরের উপর এক খানা মসজিদ নির্মিত হয়। উহার খেদমতের জন্য মিঞা বংশধরেরা ১২০০ বিঘা জমি লা-খেরাজ ভোগ করিয়া থাকেন।

CamScanner

কে কখন এই মসজিদ নির্মাণ করেন, কেই বা এত বড় সম্পত্তি ওয়াকফ্ করিয়া দেন, কোন পুরাতত্ত্ববিদ বা সরকারী পুরাতত্ব বিভাগ তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে এই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দরবেশের জীবন বৃত্তান্তের উপর আলোকপাত হইতে পারিত।

———

উলুজ খান জাহান

যশোর-খুলনার বহু প্রাচীন শহর, বন্দর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, মসজিদ পুকুর, এক কথায় প্রায় প্রত্যেকটি বালুকণার সহিত এক মহামান্য রাজঋির নাম বিজড়িত। সাধারণতঃ ইণি খান জাহান আলী বা সংক্ষেপে 'খাঞ্জালী' পীর বলিয়া পরিচিত। তিনি কখন, কোথা হইতে, কেন, কিরূপে এতদঞ্চলে তশ্‌রীফ আনেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এদেশের লোকেরা এতই অকৃতজ্ঞ ও তাহাদের স্মৃতিশক্তি এতই অল্প যে, তাঁহার প্রকৃত নাম পর্যন্ত তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সমাধিলিপি দৃষ্টে প্রমাণিত হয়. তাঁহার আসল নাম উলুজ, খানজাহান তাঁহার উপাধি এবং তিনি ছিলেন বিদেশী। উলুজ তুর্কি শব্দ, কাজেই স্পষ্টতঃ তিনি তুর্কিস্তান হইতে এদেশে আসেন। তিনি সাধারণ পীর বা গাজী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাদশাহের কর্মচারী এবং খলীফাতাবাদে (বর্তমান-বাগেরহাট) রাজধানী স্থাপন করিয়া রীতিমত উযীর-নাযীর বেষ্টিত হইয়া শান শওকতের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া যান। ঘটকদিগের পুঁথিতে (পীরালি কথা) আছে :

খান জাহান মহামান বাদশা নফর।
যসোরে সনন্দ লয়ে করিল সফর ॥
তাঁর মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
* *
চেঙ্গুটির পরগণায় ছাড়িল জিগীর ॥

শাহী ফরমানের বলে তিনি তাঁহার আশ্রিত লোকদের জায়গীরাদিও দান করিতেন :

তখন ডাকিয়া দোহে আলী খাঁ জাহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান॥

বাদশাহের বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার রাজধানীর নাম দেন খলীফাতাবাদ অর্থাৎ (বাদশাহের) খলীফা বা প্রতিনিধির আবাদ (করা স্থান)। বাঙ্গালার সুলতানদের কোন কর্মচারী এরূপ গৌরবান্বিত উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া জানা যায় না। বাঙ্গালার কোন মুসলিম রাজা বা সুলতাল কখনও স্বাপদ-সঙ্কুল অরন্যানি পূর্ণ দক্ষিণ বঙ্গে হানা দেন বলিয়া জানা যায় না। তাহাদের পরাজিত হিন্দুরা ও জমিদারেরা দক্ষিণবঙ্গে আশ্রয় লন; দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে খোদ লক্ষ্মণ সেনও এখানেই পলাইয়া যান, পূর্ববঙ্গে নহে। উত্তরকালে আমরা দাউদ খাঁর মন্ত্রী শ্রীহরিকেও প্রভুর আমানতি ধনরত্ন লইয়া পলাইয়া আসিয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া এখানে একটি রাজ্য গড়িয়া তুলিতে দেখিতে পাই। প্রতাপাদিত্য ইহার এলাকা আরও অনেক বৃদ্ধি করেন। মোটের উপর বাংলার সুলতান-দের আওতার বাহিরে বলিয়া ইহা ছিল পলাতক হিন্দুদের নিরাপদ স্থান। কাজেই দিল্লীর সুলতানদের পক্ষে এই লাওয়ারিস এলাকা জয়ের ও উহাকে ভিত্তি করিয়া অবশিষ্ট বাংলা আক্রমণের প্রচেষ্টা অসম্ভব নহে।

দিল্লীর সুলতান মাহমুদ শাহ তুঘলকের (১৩৯৪-১৪১৪) জনৈক তুর্ক জওনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র হিন্দুস্তান শাসন করিতেন। তাঁহার এক উপাধি ছিল খাজা-ই-জাহান। বাঙ্গালার সুলতানেরা ভয় পাইয়া দিল্লীর পরিবর্তে তাঁহাকেই কর যোগাইতেন। তাঁহার ন্যায় যসোরের খান জাহানও কোন পুত্র-কন্যা রাখিয়া যান নাই, অর্থাৎ উভয়েই ছিলেন খোজা। কথিত আছে, তিনি ৬০,০০০ সৈন্য লইয়া সুন্দরবনে আসেন। এত বিরাট বাহিনী পোষণের ক্ষমতা তখন জওনপুরের খান জাহান ছাড়া আর কাহারও ছিল কি না সন্দেহ। এ সকল কারণে ব্লকম্যান সাহেব খাজা-ই জাহান ও খান জাহানকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। সমস্ত অবস্থা করিয়া বিবেচনা দৃশ্যতঃ ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

কিন্তু মুশকিল হইল, প্রচলিত ইতিহাসের মতে জওনপুরে খান জাহানের

মৃত্যু হয় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র লেখক যদি জওনপুরের খান জাহানের মৃত্যুর ভুল তারিখ দিয়া থাকেন, কেবল তবেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি বাঙ্গালার সুলতান ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার কয়েক বৎসর পরেও তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিরাছে। কাজেই এক্ষেত্রেও অনুরূপ ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। সেকালের ওলী-দরবেশেরা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হইতেন। কাজেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়সে জওনপুর ত্যাগ করিয়া থাকিলে, তাঁহার ন্যায় অটুট স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে আরও আটান্ন বৎসর জীবিত থাকায় অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। কুফরস্তানে রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার করিয়া শেষ জীবনে পূণ্য সঞ্চয় তাঁহার এই অভিযানের উদ্দ্যেশ্যে ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জওনপুরের পরবর্তী সুলতানগণের মৃত্যুর তারিখও কি ভুল? খাজা-ই জাহানের মকবরার সন্ধান পাওয়া গেলেই সমস্যার সুরাহা হইতে পারে। উহা কি জওনপুরে নাই? তথাকার কেহ এই খবরটা দিতে পারিলে এই সমস্যা নিরসনের সুবিধা হইতে পারে।

তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরোলিয়া বা পীরাল্যা গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষা দান করেন। তখন তাঁহার নাম হয় মুহম্মদ তাহির। ইনিই পথ-প্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে যসোরে আনেন, কাজেই তিনি গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপের পথে (যসোর) বারবাজারে উপস্থিত হন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রচারপদ্ধতি ছিল অন্যান্য গাজী, ফকীর বা বিজেতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তিনি তাঁহার বিরাট বাহিনীর সাহায্যে জঙ্গল আবাদ, প্রজাপত্তন, রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন এবং মধ্যে মধ্যে শহর প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেন। যুদ্ধ যে তিনি করেন নাই এমন নহে; বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ রণবিজয়পুর গ্রাম ইহার প্রমাণ; কিন্তু তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ও জনহিতকর কার্যাবলীতে মুগ্ধ হইয়া লোকে সাধাণতঃ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করিত। তাঁহার বিপুল জন-বলে ভয় পাইয়া ক্ষুদ্র রাজারা বিনা বাধায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

পথিমধ্যে স্থানে স্থানে তিনি এক বা একাধিক মুরীদকে বন আবাদ ও ধর্ম প্রচারের জন্য রাখিয়া যাইতেন; কোন স্থানে দীর্ঘকাল থাকিলে

তাঁহাদিগকে নিকটবর্তী অঞ্চলেও প্রেরণ করিতেন। বার বাজারে তিনি অনেক বৌদ্ধকে দীক্ষা দান করেন। পূর্বাগত বারজন আওলিয়াও তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। গরীব শাহ ও বৈরাম শাহ নামক দুইজন দরবেশকে তিনি যসোরে রাখিয়া যান। তাঁহাদের মসজিদ ও দরগাহ এখন সর্বজাতির তীর্থস্থান। মুড়লীতে গিয়া তিনি একটি শহর স্থাপন করেন, এজন্য উহার নাম হয় মুড়লী কসবা (শহর)।

মুড়লী হইতে খান জাহানের সৈন্যদল দুইভাগে বিভক্তি হয়। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর বুড়া খান ও তৎপুত্র ফতেহ খান একদল লইয়া রাস্তা প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন ও ধর্ম প্রচার করিতে করিতে খানপুর, বিদ্যানন্দকাঠি ও আমাদি হইয়া সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য মধ্যস্ত বেদকানী পর্যন্ত অগ্রসর হন। খানপুরে বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। বিদ্যানন্দকাঠিতে তাঁহারা একটি বিশাল (১৬০০ × ৭০০ হাত) দীঘি খনন করেন। আসে পাশেও কয়েকটি দীঘি খনন করা হয় ও মাগুড়া ঘোনায় একটি মসজিদ (৪৫´×৪০´) নির্মিত হয়। লস্করবেড়ের লস্কর দীঘিতে এখনও সারা বৎসর সুমিষ্ট পানি থাকে। লোনা পানির দেশ দক্ষিণ বঙ্গে এ সকল মিঠা পানির পুকুর এক অমূল্য সম্পদ। রাস্তা দ্বারা বন্যার লোনা পানির উপদ্রব হইতে ফসল ও জমি দুই-ই রক্ষা পাইত। জঙ্গল কাটিলে সাপ ও বাঘ-ভাল্লুক দূরে সরিয়া যাইত। আবাদি এলাকার পরিমাণ ও জন-বসতি বাড়িত। কাজেই লোকে তাঁহাদিগকে ধর্ম ও দয়ার প্রতীক মনে করিয়া দলে দলে মুসলিম হইয়া যাইত।

বিদ্যানন্দকাঠি হইতে বুড়া খাঁর একদল অনুচর কপোতাক্ষের তীর ধরিয়া দক্ষিণে সুজন শাহ পর্যন্ত গমন করেন। গোপালপুরের খাঞ্জালী মসজিদ, মেহেরপুরে পীর মেহেরউদ্দীন ও মাগুড়ায় পীর জয়ন্তী ও সুজন শাহ নামীয় ফকীরের দরগাহ্ তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। পীর জয়ন্তীর দরগাহ্র অনেক পীরোত্তর আছে; আম্বুবাচীর সময় এখানে মেলা বসে।

বুড়া খান স্বয়ং আমাদিতে তাঁহার আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে এখনও তাঁহার গড়বেষ্টিত বাড়ী ও ফতেহ খাঁর সমাধির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। বহু হিন্দু-মুসলিম এই সমাধিতে মানত করে। গ্রামের উত্তরে তাঁহারা একটি নব গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন; কালে উহা মৃত্তিকা নিম্নে চাপা পড়িয়া যায়। কিছুকাল পূর্বে কৃষকেরা জঙ্গল কাটার সময় উহা দেখিতে পায়, পরে মাটি খুড়িয়া উহা বাহির করা হয়। ৪০ বর্গফুট ও চারি মিনার বিশিষ্ট এই মসজিদটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য কীর্তি।

অবশিষ্ট লোকজন লইয়া খান জাহান নিজে ভৈরবের তীর ধরিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। বার বাজার হইতে সত্তর মাইল দীর্ঘ খাঞ্জালী রাস্তা ও উহার দুই দিকের অসংখ্য কীর্তি তাঁহার গতিপথের নির্দেশ দিতেছে। রামনগরে তিনি একটি দীঘি খনন করান; ইহাতে বার মাস পানি থাকে। মুড়লীর বাইশ মাইল দূরস্থ পয়োগ্রামে তাঁহার দ্বিতীয় শহর গড়িয়া উঠে; ইহার নাম পয়োগ্রাম কস্‌বা। ইাহার প্রধান রাস্তাটি ছিল ৫০ ফুট চওড়া; উত্তরাংশে তিনি নিজের আবাসবাটি ও মসজিদ নির্মাণ করেন; উহার নাম হয় খান জাহানপুর বা খাঞ্জেপুর। নদী তীরে ৮ ফুট উচ্চ ও ১০০ বর্গফুট একটি প্রকাণ্ড ঢিবি আছে, সেখানে তাঁহার মসজিদ বা দরবার গৃহ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রতিভাবলে মুহাম্মদ তাহির কালক্রমে উযীরী লাভ করেন। তাঁহার হাতে পয়োগ্রামের শাসনভার অর্পণ করিয়া খান জাহানের আবার যাত্রা শুরু হইল। তাহিরের চেষ্টায় স্থানীয় জমিদারবর্গসহ বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। ধর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি 'পীর আলী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এজন্য ইহারা ও এভাবে পরবর্তীকালে দীক্ষিত মুসলিমেরা 'পীরালী' মুসলিম নামে পরিচিত হয়; তাহাদের সহিত সংশ্রব দোষে যে সকল হিন্দু পতিত হয় তাহারা হয় 'পীরালী ব্রাহ্মণ', 'পীরালী কায়স্থ' ইত্যাদি। মওলানা আকরম খাঁর পূর্ব পুরুষেরা পীরালী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

CamScanner

খান জাহান কিছুকাল বাসুড়ী গ্রামে থাকিয়া একটি প্রকাণ্ড (৫৫০ × ৪৫০ হাত) দীঘি খনন করান; পাড়সহ ইহা ৭০ বিঘা জমি দখল করিয়া আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দীঘিটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে। শুভরাঢ়া গ্রামে একখানা জরাজীর্ণ এক গম্বুজের মসজিদ (২৮॥ বর্গফুট) এবং নাউলী ও ধূল গ্রামের মধ্যে বৃহৎ খাঞ্জালী রাস্তা ও খাঞ্জালী দীঘি অদ্যাপি তাঁহার স্মৃতি জিয়াইয়া রাখিয়াছে; কিছুদুর গিয়া তিনি যেখানে ছাউনি ফেলেন, উহার নাম হয় বারাকপুর (অশ্বশালা বা সেনা-নিবাস)। বারাকপুর হইতে সেনের বাজার পর্যন্ত আট নয় মাইল রাস্তা এখন খুলনা-মুজদাখালী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড রোডে পরিণত হইয়াছে। বল্লভ-পুরের আঁধি পুকুরও তাঁহার খনিত। ক্রমে বর্তমান বাগেরহাটের সন্নিকটে আসিয়া তাঁহার যাত্রা শেষ হয়। এখানে আবার তাঁহার ছাউনি পড়ে বলিয়া ইহারও নাম হয় বারাকপুর। বারাকপুরে তিনি সুগভীর 'ঘোড়াদীঘি' খনন করান; ইহার দৈর্ঘ ১০০০ হাত ও প্রস্থ ৬০০ হাত; এত চমৎকার পানি সীতারামের দীঘি ছাড়া দক্ষিণ বঙ্গে সম্ভবতঃ আর নাই। ইহারই পূর্ব তীরে বিখ্যাত ষাট গম্বুজের মসজিদ (১৫৯॥ × ১০৪॥ ফুট)। ২১ ফুট উচ্চ এই বিরাট মসজিদের ৭৭টি গম্বুজ সাত সারিতে ৬০টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। সাত সারি গম্বুজ কিম্বা দূর হইতে সাতটি গম্বুজ মাত্র দেখা যায় বলিয়া ইহার এই নাম; সম্ভবতঃ ইহা আরবী সেত্তুন (সাত) এর অপভ্রংশও হইতে পারে। আমরা এখন সাতকে বিকৃত করিয়া 'ষাট' বলি। সাধারণতঃ ইহা 'ষাট' গুমট' (স্তম্ভ) বলিয়া পরিচিত। অপূর্ব স্থাপত্য-কৌশলের গুনে গম্বুজগুলি এখনও বেশ দৃঢ় আছে। খান জাহান এখানে দরবারে বসিতেন।

ষাট গম্বুজ হইতে উত্তরে মগরাখাল মুখী রাস্তার পূর্ব ধারে ছিল খান জাহানের পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ ও মসজিদ, সেখানে আছে এখন ১৫০′-১২০′ বিস্তৃতি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক-স্তুপ। কোতওয়ালী চৌতারারও একই দুরবস্থা।

ষাট গম্বুজের এক মাইল পুর্বে ও বাগেরহাটের তিন মাইল পশ্চিমে

৪০ ফুটেরও অধিক প্রশস্ত একটি উত্তর-দক্ষিণমুখী সুদীর্ঘ রাজপথ আছে; এই রাস্তার প্রায় আধ মাইল দক্ষিণে গেলে ঠাকুর দীঘি পাওয়া যায়। জঙ্গলাকীর্ণ ও দামদল পূর্ণ হইলেও ইহার পানি বেশ নির্মল। ১৬০০ বর্গফুট দীঘিটি এখন কুম্ভীরের আস্তানা। দর্শকেরা এইগুলিকে খাবার দেয়। খাবার নিতে ইহারা ঘাটের নিকটে আসে। ইহার উত্তর পাড়ে ৬০ ফুট প্রশস্ত একটি প্রকাণ্ড ঘাট, ঘাটের উপরে ৪৬ বর্গফুট একটি সমাধি-গৃহে খান জাহান অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। পশ্চিম পাশে পীর আলীর শূন্যগর্ভ কবর।

তাঁহার কেরামতে চাটগাঁ হইতে সমুদ্র দিয়া পাথর ভাসিয়া আসিত বলিয়া গল্প আছে; তাহা ভিত্তিহীন। ইহার প্রমাণ জাহাজঘাটা; জাহাজ ভিড়িত বলিয়াই ইহার এই নাম।

দক্ষিণ বঙ্গে ইষ্টকালয়ে লোনা ধরে বলিয়া খান জাহান নাকি সুদূর চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনাইয়া তাঁহার অট্টালিকাসমূহের নিম্নভাগ পাথরে গাঁথিয়া দেন। কিন্তু চাটগাঁয়ে পাথর নাই। সুতরাং এগুলি জাহাজে করিয়া জলপথে রাজমহল হইতে আনিত হয়। তথাপি তাঁহার টাকার লোভে লোকে এগুলির অপুরণীয় ক্ষতি করিয়াছে। তিনি জঙ্গল কাটিয়া বারাকপুর হইতে পূর্বে ভৈরবের তীর ও উত্তরে মগরার খাল হইতে দক্ষিণে কাড়াপাড়া পর্যন্ত প্রায় ২০ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করেন ও উহার রাস্তাগুলি পাকা করিয়া দেন; বরিশালের ভিতর দিয়া তিনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত আর একটি রাস্তা নির্মাণ করেন; উহারও একাংশ বাঁধাইয়া দেওয়া হয়। বিনা মেরামতে পাঁচশত বৎসর পরেও এগুলি এখনও অনেকটা ভাল আছে; এমনি ছিল তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি।

খলীফাতাবাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে বারাকপুর, বাগেরহাট, বাগমারা, রণবিজয়পুর প্রভৃতি বহু গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সমুদয় গ্রামে খান জাহান ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অসংখ্য কীর্তি বিদ্যমান আছে; ধ্বংসাবশেষ আছে আরও অনেক বেশী। তন্মধ্যে আধ মাইল লম্বা

'পঁচা দীঘি, দিদার খাঁর নব গম্বুজের মসজিদ (৪০ বর্গফুট) এবং এখ্‌তিয়ার খান দরিয়া খান ও আহমদ খাঁর দীঘি ও মসজিদ উল্লেখযোগ্য। আরও কত মসজিদ ও অট্টালিকা যে লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোতওয়ালী চৌতারা, বসুবাটীর মসজিদ, হাম্মাম ও প্রাচীরবেষ্টিত কূপ এবং বাদামতলা, রণবিজয়পুর ও সুন্দর ঘোনার মসজিদ ইহার দৃষ্টান্ত। প্রত্নতত্ব বিভাগ চেষ্টা করিলে মুড়লী বাজার, খলীফাতাবাদ ও অন্যান্য স্থানের ধ্বংসস্তূপ হইতে ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা উদ্ধার করিতে পারেন। হিন্দু-বৌদ্ধ স্মৃতি চিহ্নের মোহ ছাড়িয়া এদিকে তাঁহাদের নজর পড়িবে কি?

কথিত আছে, খান জাহান তাঁহার ৩৬০ জন সহচরের প্রত্যেকের জন্য একটি দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করান; এ যাবত শতাধিক মসজিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, চেষ্টা করিলে আরও পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই তাঁহাদের সংখ্যা যে ঠিক ৩৬০ না হইলেও তাহার কাছাকাছি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাগরহাটের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও ভৈরবের কূলবর্তী স্থানগুলিতে ধর্মপ্রচারার্থ গিয়াও তাঁহারা অনেক পূর্ত-কার্য সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে আফরার ল'র দীঘি, খলসার বুড়া খাঁর দীঘি, রাজপুরের যাজীবুনিয়া, বাদখালীর তালপুকুরিয়া, কামটা ও সয়ীদ মহল্লার খাঞ্জালী দীঘি এবং ফকীরহাটের দরবারের মসজিদ ও মূলঘরের 'জিন্দার আলী খাল' প্রভৃতি প্রধান।

খান জাহান প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের একাংশ আবার এই-রূপে মজুরির আকারে তাহাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিতেন, কিছু দান করিতেন ও বাকীটা তাহাদেরই জন্য গাড়িয়া রাখিতেন। তাঁহার গাড়া টাকা পাইয়া বহু লোক ধনবান হইয়াছে। এবং এইজন্যই তাঁহার অনেক কীর্তি নষ্ট হইয়াছে। এখনও জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহার নামে মানত করে, শিরনী দেয় ও নানা স্থানে মেলা বসায়। তন্মধ্যে ঠাকুর দীঘি, বাহুড়ীর দীঘি, ও বিদ্যানন্দকাঠির দীঘির পাড়ের মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় কীর্তিমান সাধুপুরুষের প্রতি এভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন না করিলে আর করিবে কাহাকে? কীর্তিযশ্য স্বঃ জীবতি।

———

বড় খান গাজী

সুন্দরবনের গাজীদের মধ্যে আর কেহ, এমন কি মহামতি খান জাহানও বড় খান গাজীর ন্যায় এত খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। দুর্দান্ত, নরখাদকদের বশীভুত ও ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দু রাজাদের পর্যুদস্ত করিয়া তিনি পৌরাণিক বীরপুরুষে পরিণত ও পাঁচ পীরের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন। অজস্র ঐতিহাসিক কীর্তি সত্ত্বেও কৃতি পুরুষ খান জাহানের এতবড় সৌভাগ্য হয় নাই। গাজীর কোন পুকুর নাই বা মসজিদ নাই। রাস্তাঘাটও বিরল, দান করার মত টাকাকড়িও তাঁহার বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি তাঁহার কীর্তি ধ্বনিত হয় নিয়ত লোকের মুখে, কালির আঁখরে। তাঁহার 'গীত' আছে, 'পট' আছে, সর্বোপরি আছে 'কালুগাজী চম্পাবতীর' পুঁথি; বাংলা (পশ্চিম বঙ্গ) ও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ইহা সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামে যে ভাটী মুল্লুকের, বিশেষতঃ খুলনা-যসোরের কত স্থানের নাম (যথাঃ-গাজী-পুর, গাজীর ঘাট, গাজীমুড়া, গাজীর জাঙ্গাল) হইয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? অবশ্য এগুলির কিছু অন্যান্যের নামেও হইতে পারে, নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই গাজী সাহেব কে এবং তিনি কখন, কোথা হইতে আসিয়া কিরূপে এত বিখ্যাত হন, ইতিহাসে তাহার কোনই সদুত্তর মিলে না। তাঁহার ইতিবৃত্তের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় পুঁথি, উপকথা ও জনশ্রুতির উপর। 'গাজীর গীতে' আছে:

পোড়া রাজা গয়েসদ্দি, তার বেটা সমশদ্দি,
পুত্র তার সাই সেকান্দর:
তার বেটা বড় খান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের কাজী
কলি যুগে যার অবসর।

বাঙ্গালার সুলতান শামসুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীনের পিতামহ, পুত্র নহেন। গিয়াসুদ্দীন দক্ষিণ বঙ্গে গিয়া রাজ্য বিস্তার করার জন্য কোন ভ্রাতাকেই অবশিষ্ট রাখেন নাই। দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকেরও এরূপ কোন পুত্র বা পৌত্র ছিল না। প্রায় এক শত বৎসর জীবিত থাকিয়া গাজীর শ্যালক ঠাকুরবরের মৃত্যু হয় প্রতাপাদিত্যেরও পরে। কাজেই গাজীর আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে। সুলতান সিকান্দর ও দুই গিয়াসুদ্দীন ইহার অনেক পূর্বের লোক। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও সহিত গাজীর কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না; তবে তিনি যে সিকান্দর নামক কোন এক রাজার পুত্র, পুঁথিতেও তাহার সমর্থন আছে।

এখানে আমরা গাজীর নাম পাই বড় খান গাজী; এই নাম চম্পাবতীর পুঁথিতে নাই, 'বন বিবির জহুরানামা'য় আছে; রায় মঙ্গলেও আছে:

বড় খাঁ গাজীর সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তালি হইল তারপর।

কাজেই তাঁহার নাম যে বড় খান গাজী, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাইতেছে। তিনি বড় গাজী, শাহ গাজী বা শুধু গাজী সাহেব নামেও পরিচিত।

তিনি কোথাকার লোক, কে-ই বা তাঁহার জনক? চম্পাবতীর পুঁথিতে আছে:

বৈরাট নগরে ঘর সাহা সেকান্দর।
স্বর্ণ দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট শহর॥
বলি রাজা তার সনে সংগ্রামে হারিয়া।
আপন কন্যার সাতে দিয়াছিল বিয়া।

পুঁথি সম্মুখে নাই। ছোটকালে পড়িয়াছিলাম, মুখস্থ লিখিতেছি। তথাপি দুই একটি শব্দ (সনে, সাতে) ছাড়া কোথাও হের-ফের হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস। এখানে আমরা তাঁহার বাড়ীর সঠিক পরিচয় পাই। সুতরাং বাঙ্গালা বা দিল্লীর সুলতানদের সহিত তাঁহার যে কোন জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল না, এই সূত্রেও তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু

এই বৈরাটনগর কোথায়? বাঙ্গালায় এমন কোন স্থানের নাম নাই। সিলেটের আজমীরীগঞ্জের নিকটে বিরাট একটি গ্রাম আছে; উহার কিছু দূরে আছে 'নগর'। ইহাই কি সেই বৈরাটনগর? বাণিয়াচুঙ্গও পূর্বে 'নগর' বলিয়া কথিত হইত; এখন 'নগর' উঠিয়াছে গিয়াছে। বৈরাট-নগরেরও অনুরূপ অবস্থা হইতে পারে; কিম্বা খলীফাতাবাদ ভাঙ্গিয়া যেমন অনেকগুলি গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈরাট নগরের বেলায়ও তাহা ঘটা বিচিত্র নহে। বগুড়া, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে হ্রস্ব-ইকার সময় সময় দীর্ঘ ইকার রূপে উচ্চারিত হয় যথা,

কোম্পানীর ইঞ্জিলের কলে কল টিপিলে ধূয়া চলে
হু হু শব্দ নৈরাকার
—আবদুল আলী গাড়লীর পুঁথি

সুতরাং বৈরাট যে বিরাট শব্দেরই বিকৃত উচ্চারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখানেই প্রাচীন আজ মর্দন রাজ্য অবস্থিত ছিল, আজমিরী গঞ্জ অদ্যাপি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। বৈরাট নগর সম্ভবতঃ ইহারই রাজধানী ছিল, আর সিকান্দার শাহ ছিলে ইহার রাজা, সম্ভবতঃ সামন্ত নরপতি। ইহা সাগর তীরে অবস্থিত। আজমীরী গঞ্জ নদীর তীরে, তাহা ছাড়া সিলহট হাওরের দেশ, হাওর শব্দটি সাগর, তথা সায়র শব্দের অপভ্রংশ। নোয়াখালীর ন্যায় সিলহটীরাও দন্তস্যকে 'হ' রূপে উচ্চারণ করে; এভাবে সায়র হাওর হইয়া গিয়াছে। বলি রাজার বাড়ী ছিল পাতালে। পাতাল অর্থ নিম্নভূমি বা হাওর এলাকা। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে নিম্ন বলিয়া হল্যাণ্ডকে নিদারল্যাণ্ড বা পাতাল পুরী বলা হয়। স্পষ্টতঃ বলি রাজা ছিলেন কোন হাওর এলাকার রাজা। এরূপ করদ রাজার অভাব ছিল না। গাজী সাহেব জলপথে সুন্দরবনে যান; কাজেই উড়িষ্যা, আসাম বা বাংলাদেশ হইতে যাওয়াই সম্ভব; কিন্তু তাঁহার কবর রহিয়াছে সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গাজীপুরে। উড়িষ্যার বা বাংলাদেশের হইলে তিনি সুন্দরবন হইতে সুদূর আসামে মরিতে

যাইবেন কোন দুঃখে ? পাঁচ পীরের মোকাম একটা আছে সোনারগাঁয়ে, আর ইহা সিলেটে। তাঁহার কবরে কিছুদিন পূর্বেও রাত্রে ব্যাঘ্রের আনাগোনা চলিত। জঙ্গল কাটায় এখন আর আসিতে পারে না, তাহা হইতে সুন্দরবনের শার্দুলেরা প্রকৃতই তাঁহার বশীভূত ছিল, একথা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যাহা হউক, কাজেই গাজী সাহেব সিলেটী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। গাজীপুরের পূর্ব নাম বিশগাঁও ; অষ্টগ্রামের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ; বিশগাঁও নিশ্চিত পূর্বে আরও বিরাট গ্রাম ছিল। ইহা বৈরাটনগর হইতে পারে। নাম-সাদৃশ্য হইতে এই অনুমান অসম্ভব মনে হয় না, তবে অবশ্য বর্ণিত প্রমাণ হইতে প্রথম অনুমান অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য এই সিদ্ধান্ত-পথে একটু অসুবিধা আছে। ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর এক পুত্রের নামও ছিল বড় খান গাজী। আমাদের গাজীর ন্যায় তিনিও এক হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন ; কিন্তু ঐ রাজা ছিলেন স্থানীয় লোক, ব্রাহ্মণনগরের মটুক রায় নহেন। বিশেষতঃ এই গাজী সাহেবের পিতা নিজেও একজন হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জাফর খান গাজী তেমন কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া জনা যায় না। অন্যান্য বিশদ বিবরণও মিলে না। তাহা ছাড়া তৎপুত্র বড় খান গাজী পাঁচ পীরের অন্যতম নহেন ; তাঁহার প্রাদুর্ভাব ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে, গাজী সাহেবের আনুমানিক দুই শতাব্দী পূর্বে। কাজেই দুই বড় খান গাজী এক হইতে পারেন না।

'কালু গাজী চম্পাবতী' পুঁথি হইলেও ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লুকাইয়া আছে। ইহা একাধারে রোমান্স ও 'ফুতুহুশ্ শাম', 'জঙ্গে রুম ও ইউনান' প্রভৃতির ন্যায় পুরাপুরি না হইলেও আংশিক ভাবে ঐতিহাসিক কাব্য। একমাত্র পুত্র হইয়াও দরবেশী লওয়ায় তিনি পিতার নিকট নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হন। তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, হাতীর পায়ের নীচে মাড়ান হয়, বুকে পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা

হয়; সাগরে চিহ্নিত সূঁচ ফেলিয়া তাহা তুলিয়া আনিতে বলা হয়। আল্লাহ্‌র দয়ায় গাজী প্রত্যেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পিতার হৃদয়-হীনতায় বিরক্ত ও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইয়া পোষ্যভ্রাতা কালুসহ গাজী সুন্দরবনে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার কেরামতিতে নারী ও বনের বাঘেরা তাঁহার বশীভূত হইল। তবে 'ব্যঘ্র' বলিতে পুথিকারেরা ভয়াবহ মল্ল জাতীয় বন্য লোকদেরও বুঝাইয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু গাজী কেবল বাঘের রাজা হইয়া থাকিতে ফকীরী লন নাই। বনের উত্তর প্রান্তে সভ্য জাতির বসতি ছিল এবং কয়েকজন হিন্দু রাজা গৌড়ের সুলতানদের আক্রমণের পাল্লা হইতে নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া সেখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। ছাপাইনগরের শ্রীরাম রাজা ও ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট রায় ছিলেন তন্মধ্যে প্রধান। মুকুট রায়ের রাজ্য ছিল মহেশপুর হইতে পশ্চিমে গঙ্গা ও দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন মুসলিম তাঁহার রাজ্যে পদার্পণ করিলে তাহার আর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। এজন্য তাহারা গাজীর বিরাগভাজন হইলেন। গাজী কালু ছাপাইনগরে পেঁাছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা অনেক শিষ্য সংগ্রহ করেন বলিয়া মনে হয়। রাজার সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। রাজা সপরিবারে নিহত ও দেশশুদ্ধ লোক ইসলাম গ্রহণ করিল। সেখানে সর্বপ্রথম এক সুবর্ণমণ্ডিত মসজিদ উঠিল।

বার বাজার ষ্টেশনের এক মাইল পূর্ব দিকস্থ বাদুরগাছা মৌজার পশিম অংশকে পূর্বে ছাপাইনগর বলা হইত। সেখানে গাজীর মসজিদ নাই; কিন্তু শ্রীরাম রাজার দীঘি ও গভীর দুস্তর পরিখা-বেষ্টিত রাজবাড়ীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। গড়ের দক্ষিণ পাড়ে এক বৃহস্পতিবারে গাজী যেখানে প্রথম আস্তানা গাড়েন, সেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে এখনও বাঘের আনাগোনা হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বার বাজার হইতে যসোর পর্যন্ত 'গাজীর জাঙ্গাল' নামে যে রাস্তা আছে, তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ হওয়া সম্ভব।

সিলেটের মোকামের খাদিমকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহারা

ছিলেন পাঁচ ভাই ও হজরত শাহ জালালের সহচর। তিনি যে দুই, তিন ভাইয়ের নাম বলিলেন, তাঁহাদের সহিত পাঁচ পীরের কাহারও নাম মিলে না। শাহ জালালের সহিত সবাইকে জড়াইবার আগ্রহাতিশয্যে ইহারা আসল পাঁচ পীরকে ভুলিয়াই গিয়াছেন। বার বাজারের অল্প দক্ষিণে মাস্‌নে-হাসিল বাগ নামে একটি গ্রাম ছিল; গাজী সেখানে গিয়া জামাল গোদা নামক এক ব্যক্তির রোগ আরোগ্য করেন ও শ্রীরাম তাঁতীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ধনবান করিয়া দেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, মুসলিম বিদ্বেষীদের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেও তিনি জাতিগত ভাবে হিন্দুদ্বেষী ছিলেন না। অতঃপর গাজী-কালু সোনাপুরে গিয়া কিছু কাল স্থানীয় মসসিদে অবস্থান করেন। উহা হাতিয়াগড় তহ্‌সিলের অন্তর্ভুক্ত ও কলিকাতা ডায়মণ্ডহারবার রেলপথে একটি বিশিষ্ট জংশন।

এবার মুকুট রায়ের উপর গাজীর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার সাত পুত্র ও চম্পাবতী নামে এক পরমা সুন্দরী দুহিতা ছিল। তাঁহার রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া গাজী তাহার প্রেমে পড়িলেন। কালু ঘটক হইয়া ব্রাহ্মণ নগরে চলিলেন। অবশ্য ইহা ঝগড়া বাঁধাইবার একটা ফন্দিও হইতে পারে। প্রস্তাব শুনিয়া রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া কালুকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এবার যুদ্ধের ছুতা মিলিল। গাজী তাঁহার ব্যাঘ্র বাহিনী লইয়া ভ্রাতার উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হিজলী ও হাতিয়াগড় হইতে এসকল সৈন্য সংগ্রহ করেন। গৌড়ের সুলতান হুমায়ন শাহ তাঁহাকে কিছু সৈন্য সাহায্য পাঠাইয়া থাকিতে পারেন। রাজা তাঁহার সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণা রায়ের সাহায্যে কিছুকাল আত্মরক্ষা করিলেন। শেষে হারিয়া গিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্র কামদেব ও কন্যা চম্পাসহ রাজা রাণী ইসলাম গ্রহণ করিলেন। গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ হইল।

দক্ষিণা রায় কিন্তু মাথা নোয়াইলেন না। তিনি প্রথমে দক্ষিণ দিকে পলাইয়া গেলেন; শেষে সম্ভবতঃ খনিয়াতে আর একটি ঘোর যুদ্ধের

গর গাজীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাহারও মতে মুকুট রায়ের রাজধানীর নাম ছিল খনিয়া। তাহা হইলে হয়তো সেখানে শুধু ব্রাহ্মণের বাস ছিল বলিয়াই উহা ব্রাহ্মণনগর নামে অভিহিত হয়।

ব্রাহ্মণনগরকে কপোতাক্ষ তীরস্থ লাউজানি সনাক্ত করা হইয়াছে। ইহা ঝিকরগাছা ষ্টেশনের সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত। লোকে এখনও সেখানে মৃত্যুঞ্জীব কূপের অবস্থান দেখাইয়া থাকে। ইহার জল ছিটাইয়া রাজা তাঁহার নিহত সৈন্যদের জীবিত করিতেন। এজন্যই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। গাজী ব্যাপার টের পাইয়া গোমাংস ফেলিয়া উহা অপবিত্র করিয়া দেন। তখন তাঁহার জয় হয়।

পুঁথিতে বলিলেও গাজী চম্পাকে সঙ্গে লইয়া যান বলিয়া মনে হয় না। কালুর তিরস্কারে তাঁহার মোহ ছুটিতে পারে কিম্বা প্রিয়জনের শোকে চম্পাও পিতৃ ভিটায় থাকিয়া যাইতে পারেন। শেষ জীবন ধর্ম-কর্ম ও দান দক্ষিণায় অতিবাহিত করিয়া তিনি মাই চম্পা নামে বিখ্যাত হন। সাতক্ষীরার নিকটে লাবণ্য গ্রামে দরগাহ ও বারাসাতের নিকটস্থ ঘোনা গ্রামে তাঁহার একটি আস্তানা আছে। তাহার ভ্রাতা কামদেব ঠাকুরবর নামে পরিচিত হইয়া গোবর ডাঙ্গার দক্ষিণস্থ চারঘাটে ফকীরী জীবন যাপন করেন।

গাজীর নাম শুনে নাই ভাটি মুলুকে এমন লোক নাই, আশেপাশেও আছে কি না সন্দেহ। তিনি হিন্দুর দেবতা ও মুসলিমের পীর। যসোর খুলনায় গাজীর পূজা হয়। হিন্দু ও মুর্সলিম সকলেই গাজীর নামে শিরনী দেয়। এক সময় এদেশে গাজীর গীতের অত্যধিক প্রচলন ছিল; তাঁহার কীর্তি লম্বা কাগজে নানা রঙ্গে আঁকিয়া দেখান হইত। ইহাকে 'গাজীর পট' বলে। লোকে এখনও অতি রঞ্জিত দীর্ঘ ক্লান্তিকর কাহিনীকে 'গাজীর পট' ও 'গাজীর গীতের আলাপ' বলে।

এগুলির জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলেও পুঁথিয়ালেরা যখন সুর করিয়া গাজীর পুঁথি পড়ে তখন পার্শ্ববর্তী নৌকা বা গৃহ হইতে সমজদার শ্রোতা জুটিয়া থাকে। কেহ কেহ বল প্রয়োগ করিলে মযলুম ব্যক্তি এখনও

সময় সময় গাজীর নাম স্মরণ করে। মাঝি মাল্লারা ভক্তিভরে তাঁহার নাম না লইয়া এবং দাঁড় ও হাইল না ছুইয়া সহজে নৌকা ছাড়ে না। তরঙ্গের তালে তালে নৌকা যখন বিপদজ্জনক ভাবে দুলিতে থাকে, তখন তাহারা হতাশ না হইয়া গান করে :

আমরা আজি পোলাপান, গাজী আছে নিগাবান
শিরে গঙ্গা ধরিয়া, পাঁচপীর বদর বদর।
গাজী সাহেব মরিয়াও অমর।

— — —

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ